পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

সিনেকবিতা বনাম কবিতাচিত্র - ১

কবিতাভাবনার অনুপ্রেরক হিসেবে সিনেমার ভূমিকায় বারবার ফিরে যাচ্ছি। কজন কবি আছেন যাঁরা সিনেমাকে কবিতার হেঁসেল ঠেলতে পাঠান ? হয়তো বেশি নয়। উৎপলদা (কুমার বসু) একবার আমায় বলেছিলেন জীবনানন্দের কবিতায় সিনেমার প্রভাবের কথা - এই যে জীবনানন্দ প্রায়শই ম্যাটিনি শোয়ে ওঁর বোনের সাথে সিনেমা দেখতে যেতেন - সে শিল্প-মাধ্যমের প্রতি ওঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিলো। এ বিষয় গবেষণার যোগ্য। আশা রাখি আগামীর জীবন-গবেষকদের কেউ কেউ হয়তো এতে ব্রতী হবেন। মোটের ওপর চলচ্চিত্র-অনুরূদ্ধ কবিতা বাংলা ভাষায় হয়তো বিরল, তবু প্রশ্ন থেকে যায় - মুক্ত অনুত্তরিত প্রশ্ন। কিভাবে কবিতার কাজে লাগে চলচ্চিত্র ?

ভিনসমাজের, ভিনসংস্কৃতির, ভিন ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পূর্ণ অজানা অচেনা এক ধাপে সিনেমা আমাদের মুহূর্তে নামিয়ে দিতে পারে। যেখানে শারীরিক বা সাংস্কৃতিকভাবে হয়তো কোনোদিনও যাওয়া সম্ভব না। ভারতের আধুনিক শহরে বড় হওয়া লক্ষ লক্ষ তরুণের পক্ষে নিশ্চিন্দিপুরের পরিবেশ পাওয়া তাকে বোঝা সম্ভব হয় না, অথচ অস্ট্রেলিয়ার কোনো মাঝারি শহরে বসবাসকারী এক বাংলা শিল্প-সাহিত্য ভক্ত শ্বেতকায় যুবক হয়তো সেটা করে ফেলতে পারেন একবারো ভারতে না এসেও। গতিচিত্র দূরত্বনাশী। ভিন ইতিহাস, ভূগোল বা সংস্কৃতি গ্রাহকের হাতে নতুন তথ্য পৌঁছে দেয়। নতুন তথ্য নতুন ভাবনা অনুভূতির জন্ম দেয়। সেখান থেকেই নতুন ধারার লেখার জন্ম হতে পারে। 'সিনেপোয়েম' বা 'সিনেকবিতা' নামে এক ধরণের সাহিত্য/ফিল্ম-এর কথা শোনা যায়। যতদূর মনে হয় এই শব্দবন্ধ এখনো অনেকটাই আলগাভাবে ব্যবহৃত। কারো কাছে সেটা সিনেমা কারো কাছে কবিতা। এই আলোচনার গোড়ায় তাই আমি আমার মত করে একটা স্পষ্ট বিভাজনরেখা টেনে দিই। শ্রেণীবিন্যাস করি। আমার কাছে 'সিনেপোয়েম' বা 'সিনেকবিতা' সাহিত্য পদবাচ্য এক মুদ্রিত (পৃষ্ঠায় বা পর্দায়) রচনা যাকে কবিতাই বলা উচিত। এমন এক কবিতা যা মূলত শব্দনির্ভর এবং কোনো চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র-পদ্ধতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ সময়ে এই কবিতাকে সাধারণ একটা কবিতা হিসেবেই পড়া যায়। এর নেপথ্যে চলচ্চিত্র রয়েছে না ব্যক্তিগত বাস্তবিক অভিজ্ঞতা সেটা মূল প্রশ্ন নয়। তাছাড়া সিনেমাও এক দৃশ্য-অভিজ্ঞতা। মনন-অভিজ্ঞতা। এভাবেই হয়তো জীবনানন্দের কবিতার পেছনে কোথাও কোথাও চলচ্চিত্র গোপনে এসে তার পর্দা খাটিয়ে গেছে। 'আট বছর আগে এক দিন' জাতীয় কবিতার চিত্রনাট্য-প্রবণতার কথা সহজেই মনে আসে। উল্টোভাবে ভাবলে 'কবিতাচিত্র' বা poefilm - যা মূলত ফিল্ম, কবিতার রেণুমাখা। কিভাবে কোথায় সে কবিতার রেণু সেটা অবশ্য পাঠকের/গ্রাহকের/দর্শকের রুচির ওপর নির্ভর করবে। ফলে কারো কাছে অ্যালফ্রেড হিচককের Vertigo স্রেফ থ্রিলার মনে হবে কারো কাছে প্রত্যন্ত কবিতা।

যাকে সিনেকবিতা বলছি তার প্রথম ব্যবহার কোথায় কার হাতে - এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ চোখে পড়েনি, তবে সিনেমা/সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু প্রবন্ধমালায় আলোচিত হয়েছে। অত্যন্ত অসমান্তরাল এক ফরাসী কবি ব্লেজ সঁদ্রারই (Blaise Cendrars) হয়তো প্রথম, ইউরোপে, কবিতাশিল্পে সিনেমার আমদানী করতে শুরু করেন। পাশাপাশি ওঁরই স্বদেশী আঁতোয়ান আর্তোকেও (Antonin Artaud) ভোলা যায় না। এঁরা দুজনেই সিনেমাশিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন এবং হয় চিত্রনাট্য লিখেছেন, চলচ্চিত্র পরিচালক প্রযোজকদের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছেন কিছুদিন। একইসঙ্গে সিনেকবিতা ও কবিতাচিত্রের এক আদর্শ যৌথ উদ্যোগের কথায় আসি প্রথমে।

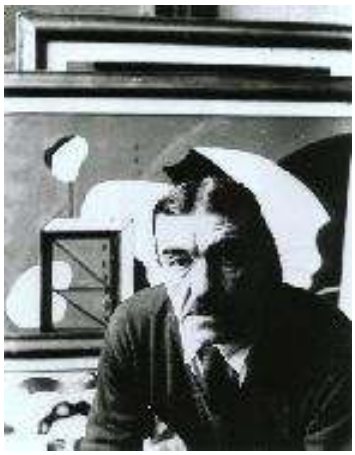

চিত্রশিল্পীও চলচ্চিত্রকার ফের্নাঁ লেঝের

ফের্নাঁ লেঝের (Fernand Léger) ব্লেজ সঁদ্রারই সমবয়সী এক চিত্রশিল্পী। গত শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে লেঝের সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্রকলার জন্ম দিচ্ছেন, পরবর্তীকালে যাকে সমালোচকরা কিউবিজ্‌ম বলবেন। জর্জ ব্রাক ও পাবলো পিকাসোর সাথে ওঁর নাম সমোচ্চারিত হয়। এঁরা কিছুদিন একসাথে কাজ করতেন। শৈল্পিক আদান প্রদান ছিলো নিরন্তর। 'কনস্ট্রাকটিভিজম' বা নির্মাণবাদ নামেও এক শিল্পান্দোলন বা শিল্পপদ্ধতির জনক বলে মনে করা হয় লেঝেরকে। ১৯২৪ সালে লেঝের তৈরি করেন একটা ছোট ফিল্ম - 'বালে মেকানীক' (Ballet Mécanique) । ছবিটা ইউ-টিউবে আজ পুরোটাই তোলা আছে যদিও উন্নতমানের প্রিন্ট আন্তর্জালের অন্যত্রও পাওয়া যায়। বিশেষত উবুওয়েব সাইটে। ওই সময়ে বাল্যকালের সিনেমাশিল্পকে দিয়ে যে এমন অদ্ভুত উদ্ভাবনী গ্র্যাফিক নৃত্যনাট্য বানানো যায় সেটাই লেঝের দেখালেন। ছবিটা কল্পনা ও কবিতায় ছাওয়া।

লেঝের ঋণ স্বীকার করেছিলেন। এক দল কবিদের কাছে, যাঁরা ওঁর ওই সময়ের বন্ধু। গীয়ম অ্যাপলিনেয়র, মাক্স ঝাকব, ইভান গ্যোল ও ব্লেজ সঁদ্রার। এদের মধ্যে সঁদ্রার নিজেও চলচ্চিত্র পরিচালনায় নেমেছিলেন এবং কিছুটা ব্যর্থই হন বলা যায়, সিনেমার প্রতি তাঁর সুগভীর দুর্বলতা ছিলো ও পাশাপাশি লেঝেরের কাজ সম্বন্ধে প্রবল আগ্রহ। এই সমস্ত কারণে বালে মেকানীক তৈরি হচ্ছে যখন, সঁদ্রার ও লেঝের এক আত্মিক যৌথতায় বাঁধা পড়েন। ফিল্মটার অনেক বিমূর্ত রূপকের মধ্যে একটা ছিলো চাকা ও ঘূর্ণ্যমানতা। এই রূপকটাকে গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন সঁদ্রার, যদিও ওই ফিল্মে ওঁর সরাসরি কোনো ভূমিকা ছিলোনা। অনেক তদানীন্তন আলোচকের মধ্যে এপস্টিন নামে একজন লেখেন -

'This film saw the birth of the first cinematic symbol. The Wheel...It rolls along as long as the heart still beats, along tracks predestined by chance, luck that can be good but generally bad. The cycle of life and death has become so jagged that it has had to be retempered lest it break.'

যন্ত্রযুগ আসার সাথে সাথে শিল্পবাস্তবতার একটা নতুন ভাষা তৈরি হচ্ছিলো, যার কিছুটা হয়তো আমাদের দেশে অনেক পরে ১৯৭০-এর দশকে, জামশেদপুরে টাটার কারখানার পরিবেষ্টনী থেকে কমল চক্রবর্তী, স্বদেশ সেন ও কৌরব গোষ্ঠীর কোনো কোনো কবি তৈরি করতে শুরু করেন। এই নতুন ভাষার সাথে যন্ত্রযুগের ভাষার একটা ছন্দময় সমান্তরাল তৈরি করে বালে মেকানীক। এবং লেঝেরের এই কীর্তির পেছনে বিশদভাবে সঁদ্রারের প্ররোচনা কাজ করেছিলো। ৮৮ বছর পরেও ছবিটার সৃষ্টিশীল দীপ্তি নিষ্প্রভ হতে চায় না। এই ধরণের কোনো কাজ ভারতীয় পর্দায় আদৌ কখনো আমরা দেখেছি কিনা জানি না। উদয়শংকরের কিছু ছবি অন্যশিল্পের সাথে কবিতার সার্থক সমন্বয় তৈরি করে ঠিক, কিন্তু মেশিনের ভাষার সাথে শিল্পের ভাষার এই জাতীয় তুলনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেই।

জাহাজের ডেকে ব্লেজ সঁদ্রার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ওঁর একটা হাত কাটা যায়। তারপর থেকে বাঁ হাতে লিখতেন।

'চাকা' সেই সময় সঁদ্রারের কাছে জীবনের পূর্ণাঙ্গ প্রতীক হয়ে ওঠে যা নানারূপে ধরা পড়তে থাকে, শুধু তার নিজের কাছে নয়, সহ-শিল্পী লেঝেরের কাছেও। চাকা ঘোরে আর ঘোরার সাথে সাথে সে তৈরি করে এক নতুন ভাষা। কিভাবে? এ সম্বন্ধে সঁদ্রার লিখেছেন - '*চাকা, জিনিসপত্র, পোর্তুগীজ, চৈনিক, সংখ্যা, কারখানার লেবেল, শিল্প-পেটেন্ট, ডাকটিকিট, টিকিট, চালানে কাগজ, চিহ্ন, রেডিও ইত্যাদি - ভাষাকে ওভারহল করে তার পুনর্গঠন হচ্ছে আর সে ত্বকের মতো নবজন্ম নিচ্ছে, ভাষা মানবচেতনার প্রতিফলন, মনের মধ্যেকার ছবিটার দিকে যেতে দিচ্ছে যে কবিতা, যেভাবে মন তাকে গড়ে তুলেছিলো সেটা দেখাচ্ছে যে কবিতা, এক লিরিক যা অনুভূতিও তার হয়ে ওঠাকে ধরিয়ে দেয়, অ্যানিমেটেড ও সার্বজনীন এক চলচ্চিত্র ভাষা ... সমস্তই কৃত্রিম ও সত্য। হাত। চোখ। সংখ্যার সেই বিরাট পশম যার ওপর ব্যাঙ্ক ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। কারখানার যৌন উত্তাপ। ঘূর্ণ্যমান চাকা। উত্তুঙ্গ চাকা।...ছন্দ। জীবন।*'

যে বছর রবি নোবেল পুরস্কার পাচ্ছেন, সেই ১৯১৩ সালে সঁদ্রার লেখেন '১২টি ইলাস্টিক কবিতা', যা চূড়ান্তভাবে চিত্রাঙ্কন ও চলচ্চিত্রশিল্পের সাথে কবিতার বেড়া ভেঙে দেয়।

এমন কবিতা যা শিল্পের নির্মাণকে নিয়ে ভাবে, যেমন লেঝেরকে নিবেদিত এই কবিতা

নির্মাণ

ব্লেজ সঁদ্রার

রঙ রঙ রঙিন
আর এই যে কলিকালের সূর্যের মতো বড় হওয়া লেঝের
শক্ত হয়ে যাচ্ছে
আর স্থিরজীবন [বা মৃত প্রকৃতি]
মাটির প্রচ্ছদ
অনচ্ছ
যে সমস্ত ঘন আঁধার
ঘোলাটে জ্যামিতি
যে মাপকাঠি পুনর্শোষিত
প্রস্তরায়ন।
গমন।

সমস্ত সাঁতরায়
আর আচমকা মন জ্যান্ত হয়ে ওঠে
    উদ্ভিদ আর প্রাণীদের সাজে
তুমুলপ্রতিভ
আর ছবি এখন
সেই বিরাট চলমান জিনিসটা
চাকা
জীবন
যন্ত্র
মানবমন
এক ৭৫-মিমি পেশোয়াজ
আমার পোট্রেট

'নির্মাণ'কে যেমন সিনেকবিতা বলা যায় তেমনি 'বালে মেকানীক' কবিতাচিত্র। এইসমস্ত যৌথতার মাধ্যমে সিনেমা ও কবিতাশিল্পে এক অদ্ভুত আন্তর্লিপিতা (intertextuality) আসছিলো। প্রায় একই সময়ে সঁদ্রারের সাথে এক চিত্রশিল্পী দম্পতির যোগাযোগ বাড়ছিলো। গড়ে উঠছিলো শিল্পসম্পর্কের আর এক আশ্চর্য যৌথতা যা শিল্পীদম্পতি ও সঁদ্রার - দু পক্ষকেই লাভবান করছিলো। ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী অধ্যায়ে কিছু ফরাসী শিল্পী, যেমন হ্রবেয়ার দেলনে (Robert Delaunay) এক নতুন ধরণের পদ্ধতিতে আঁকতে শুরু করেন। ওঁর সঙ্গী - স্ত্রী সোনিয়া দেলনে। দেলনে simultaneism বা 'একত্রবাদ' সংজ্ঞার জন্ম দেন। দেলনে চেষ্টা করছিলেন রঙের ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই এমন এক একটা আলোর উৎস তৈরি করতে যা একে অন্যের সাথে মিশে গিয়ে তাদের স্বকীয়তা হারাবে না। কিন্তু রঙের ব্যবহারে নানা বৈচিত্র্য আনলেও জ্যামিতির প্রতি ততোটা আগ্রহ হ্রবেয়ার বা সোনিয়ার ছবিতে দেখা যেত না। এই সময়েই সঁদ্রারের সাথে এঁদের আলাপ। সঁদ্রার 'উনিশটি ইলাস্টিক কবিতা' নামে এক সিরিজ কবিতা লেখেন এসময়ে। সোনিয়া দেলনের সাথে একটা যৌথপুস্তকও লেখেন - ছবি ও কবিতা মিশিয়ে। এই ইলাস্টিক কবিতাগুলো এবং সেই চাকাচিন্তার প্রভাব হ্রবেয়ারের কাজেও ছায়া ফেলে। ফলস্বরূপ জন্ম নেয় নিচের চিত্র 'সূর্য চন্দ্রের কন্ট্রাস্ট'

সোলেই, লুন, সিমুলতানে (সূর্য চন্দ্রের কন্ট্রাস্ট, হ্রবেয়ার দেলনে, ১৯১৩)

সাদাকালো ছবিতে রঙ নষ্ট হয়ে গেলেও তার উজ্জ্বলতার একটা তুলনামূলক আভাস পাওয়া যাবে। উল্টোদিকে দেলনের দম্পতির ছবির প্রভাব সঁদ্রারের কবিতায় পড়ছিলো। বিশেষ করে 'উনিশটি ইলাস্টিক কবিতা'য়। সেই ক্রমের একটা কবিতা নরওয়ের চিত্রকর এডভার্ড মুঙ্কের সুবিখ্যাত ছবি 'Scream' বা আর্তনাদ-কে কেন্দ্র করে। মূল ফরাসীর সাহায্যে রণ প্যাজেটের ইংরেজী অনুবাদের বাংলা তর্জমা রইলো নিচে -

মুঙ্ক খুঁজে পান তাঁর আর্তনাদ

অন্ধকার রাত্রি
আর আরো আঁধারি দিন
মেঘ
ঢেকে রাখে সূর্যকে
যেমন চাঁদকেও

আমি স্বপ্নে দেখি
যান্ত্রিক মাকড়শা
গুঁড়ি মেরে বেরোয়
শ্‌শ্‌শ্‌স শ্‌শ্‌শয়ে শ্‌শয়ে
খোলা কবরের
থেকে

মনে হয় যেটা
সবচেয়ে জরুরী ছিলো
সেটাই সবচেয়ে
ফেলনা

সুড়ঙ্গের শেষে
এখনো অন্ধকার

কেন কিভাবে এই কবিতা চিত্রাঙ্কনমুগ্ধ, কিভাবে সঁদ্রার-সোনিয়া দেলনে কাজে কবিতা ও ছবি একে অন্যের পরিপূরক ; একত্রবাদ কিভাবেই বা সঁদ্রার কবিতায় ধরা পড়েছে - এসবের অনেকটাই এখনো ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে অমীমাংসিত। পরে একদিন আলোচনা করা যায়। বরং প্রাসঙ্গিক বলে এখানে মনে করিয়ে দিই যে ৬০-এর দশকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও পরে অরুণ মিত্র ব্লেজ সঁদ্রারের সামান্য কিছু কবিতার বাংলা অনুবাদ করেছেন। হয়তো আরো কেউ কেউ।

আপাতবিরল হলেও পূর্ণাঙ্গভাবে না হলেও, আমাদের পরিচিত বেশ কিছু কবির কাজকে চলচ্চিত্র প্রভাবিত করেছে। ফ্রান্সে এর উদাহরণ সবচেয়ে বেশি হলেও আমাদের বাংলা ভাষায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, অনন্য রায়, সুব্রত সরকার ও অমিতাভ মৈত্রর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনুল্লেখযোগ্যদের মধ্যে এই প্রবন্ধকার স্বয়ং। আর ততোধিক বিস্ময়কর প্রেমেন মিত্তিরের কবিতা ও চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ দুঘরে করে রাখা - যেন মিশে গেলেই বিপদ। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দুজন এ পর্যন্ত স্বল্পপরিচিত কবি আস্তে আস্তে কিম্বদন্তী হয়ে উঠছেন - সেই জর্জ অপেন ও জ্যাক স্পাইসার, দুজনেই এক এক সময় ফিল্মের থেকে প্রভাব নিয়েছেন। জ্যঁ কখতোর বিখ্যাত ছবি 'অর্ফে' বা অর্ফিউসের নায়ক ছিলেন কবি। তিনি গাড়ির রেডিও থেকে দৈববাণীর মতো কবিতার লাইন পেতেন। স্পাইসার এই ছবির দ্বারা ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে রেডিওর ভাষা থেকে ছেঁকে নিতেন ওঁর কবিতার কিছু মশলা।

==========